COMPILED & CIRCULATED BY
DR. DIPAK SHOM
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

2nd Semester

Course 1 / GE-2

আলোচনা – ১

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তারিণী মাঝি' গল্পের শিল্পমূল্য

''আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে মানুষের প্রেম নির্ভরতার চরম পরাভবের ট্র্যাজেডিই এ গল্পের উপজীব্য। নিয়তির লীলা রহস্য একেবারে অন্তিম মূহূর্তে একাগ্র অনিবার্যতায় আত্মপ্রকাশ করেছে – – – – এদিক দিয়ে 'তারিণী মাঝি' ছোটোগল্পের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।''

(তথ্যসূত্র: শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা/অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য)

'তারিণী মাঝি' তারাশংকরের শিল্প প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকায় গল্পটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারাশংকরের অন্যান্য গল্পের মতো আলোচ্য গল্পেও আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী ও সুখী। এই দুই চরিত্রকে আশ্রয় করে মানব মনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। একই সঙ্গে গল্পকারের বর্ণনা নৈপুন্যে ময়ূরাক্ষী নদীটিও জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবন জীবিকার সংস্থানই করেনি, তার জীবনছন্দকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। গল্পটিতে কেবল তারিণীর জীবন আলেখ্য স্থান পায়নি, পেয়েছে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের জীবনের অমোঘ ও অনিবার্য পরিণামের প্রতিচ্ছবি। অমোঘ নিয়তির কাছে মানুষ যে কত অসহায় তারিণী মাঝির জীবনের করুণ পরিণতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তারিণী ময়ূরাক্ষী নদীর গুনুটিয়া ঘাটের খেয়া পারাপারের মাঝি। মাঝি হিসেবে তার দক্ষতার তুলনা নেই। বর্ষকালের ভরা নদীর খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে অনায়াসে মানুষ এবং পশুকে সে উদ্ধার করে আনে। এইসব ঘটনা তারিণীর দুঃসাহসিকতার পরিচয় রাখে। শুধু তাই নয়, ঘোষ মহাশয়ের পুত্রবধূকে সে যেভাবে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে উদ্ধার করেছে, তাও চরিত্রটির মহত্বকে তুলে ধরে। একান্ত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গল্পে ভিন্ন মাত্র বয়ে এনেছে।

'তারিণী মাঝি' চরিত্র মুখ্য গল্প। তারিণীই আলোচ্য গল্পর কেন্দ্রীয় চরিত্র। তারিণী চরিত্রটিকে স্পষ্টতা দিতে গল্পে স্থান পেয়েছে সুখী চরিত্রটি। সুখীকে নিয়ে তারিণীর সুখের অন্ত নেই। নিঃসন্তান এই দম্পতির জীবন পরিপূর্ণ রয়েছে ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে তারিণী ও সুখীর সুখী দাম্পত্য জীবন গল্পে আভাসিত। ঘোষবাবুর পুত্রবধূর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে তারিণী চেয়ে এনেছে একখানি শাড়ি আর ফাঁদি নথ। নথ পরা সুখীকে দেখে তারিণীর আনন্দিত হৃদয়ের ছবিটি ধরা পড়েছে এইভাবেই ———

COMPILED & CIRCULATED BY
DR. DIPAK SHOM
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

2nd Semester

Course 1 / GE-2

''নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা
তুলিয়া ধরিয়া বলিল দেখি দেখি।''

এইসব ছোটো ছোটো ঘটনা তারিণী ও সুখীর দাম্পত্য সুখের নির্দেশিকা। কিন্তু গল্পের পরিণতি অংশে এই সুখীকে তারিণী নিজের হাতে হত্যা করেছে। এখানেই রয়েছে মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের স্বরূপ সন্ধান।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড তাঁর 'মনোবিকলন' তত্ত্বে মানব মনের যে দুই আদিম প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন তার একটি হল — যৌনতা এবং অপরটি হল আত্মরক্ষার প্রবণতা। আলোচ্য গল্পে আত্মরক্ষার সেই মৌল বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতা পেয়েছে। যে সুখী ছিল তারিণীর ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন-সাধনা, যার আনন্দ বিধানের জন্য তারিণী মানুষের পরিহাস ও বিদ্রুপ গায়ে মাখেনি, রাত দুপুরে মাতাল হয়ে ফিরেও যে সুখীর গায়ে হাত তুলেনি, সেই তারিণী প্রাণাধিক প্রিয় সুখীকে গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। অন্ধ আত্মরক্ষার তাড়নাই তখন প্রবল হয়ে উঠেছে তারিণীর কাছে। সংসার, মায়া-মমতা, দাম্পত্য সম্পর্ক এই সবকিছুই মিথ্যে হয়ে গেছে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির টানে। ময়ূরাক্ষীর অতলস্পর্শী ঘূর্ণিতে তলিয়ে গেছে তারিণীর মানবিক অনুভূতি। সুখীকে হত্যা করার পর তারিণীর শেষ উপলব্ধি ধরা পড়েছে এভাবে ——

''আঃ আঃ, বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুল ভাবে
সে কামনা করিল আলো ও মাটি।''

এই 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্য দিয়ে তারিণীর জীবনার্তিটুকু স্পষ্টতা পেয়েছে। যে মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল বিপন্ন মানুষ ও পশুকে রক্ষা করা, সেই মানুষটি প্রাণের তাড়নায় হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে সুখীকে। তারিণী নামের মধ্য দিয়েও এই ব্যঞ্জনা প্রকাশিত। অপরকে ত্রাণ করা যার স্বভাব ধর্ম, সেই চরিত্রের জান্তব প্রবৃত্তির স্বরূপ উন্মোচনই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়।

তারিণীর অবচেতন মনের হিংস্রতাকে উচ্চকিত করেছে বন্যায় উন্মত্ত ময়ূরাক্ষী নদীটিও। যে ময়ূরাক্ষীর বুকে তার স্বপ্ন ও সাধনার বাস্তবায়ন ঘটেছিল সেই ময়ূরাক্ষীই তার বীভৎসতায় তারিণীকে বাধ্য করেছে সুখীকে হত্যা করতে। কাহিনীর পরিণামে তারিণী যেন তার প্রেম, বিবেক এবং কর্তব্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করেছে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর আকুতিই তখন তার কাছে হয়েছে অনেক বড়। তাই যে হাত দিয়ে তারিণী সুখীকে আদর করেছে, সেই হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরাতে দ্বিধা করেনি। বাস্তবতার এই চূড়ান্ত রূপের অনন্য পরিচয় রয়েছে 'তারিণী মাঝি' গল্পে। সুখীর প্রতি তারিণীর মানবিক প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেছে আদিম জৈব জীবন তৃষ্ণার কাছে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের কাহিনীবৃত্ত নিটোল পরিণত ও সংযত। মাত্র দুটি চরিত্রই কাহিনীর হাল ধরে রেখেছে। কাহিনী মধ্যে ঘটনাংশও স্বল্প পরিমানের। যতটুকু ঘটনা স্থান পেয়েছে তা কেবলমাত্র চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে তারাশংকরের শিল্পী স্বভাবও গল্পে স্পষ্টতা পেয়েছে। রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবন চিত্র, উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ, ধর্মীয় বিশ্বাস এমনকি ভাষা এসব কিছুই পরিচয় রেখেছেন শিল্পী তারাশংকর। শুধু তাই নয়, গল্পটিতে লেখকের বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। আধুনিক যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী না হলেও লোকায়ত মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতার অনন্য পরিচয় গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের পরিণতিতে তারিণীর 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনসত্য চিরন্তন সত্যে উন্নীত হয়েছে। এখানেই 'তারিণী মাঝি' গল্পের শিল্প সার্থকতা।